# জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

বুলেটিন নং ৮, ২য় বর্ষ, শনিবার, ৭ই নভেম্বর, ১৯৯২

# THE JUMMA SAMBAD BULLETIN

Newsletter of the Parbattya Chattagram Jana Samhati Samiti ( JSS ),
Issue 8, 2nd year, Saturday, 7th Nov. 1992.


## সম্পাদকীয়

জুম্ম জনগণকে নিজ বাস্তুভিটা, বাগ-বাগিচা ও জমিহারা তথা উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রের শেষ নেই॥ ১৯৬০ এর কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ, ১৯৭৬ সালের জুমিয়া পুনর্বাসনের নামে যৌথ খামার, গুচ্ছগ্রাম ও গ্রুপিং স্থাপন;- ১৯৭৮—৮৪ সালের মধ্যে প্রায় ৫ লক্ষ মুসলিম বাঙ্গালীকে ব্যাপকভাবে পুনর্বাসন, ১৯৮৬ সালের গুচ্ছগ্রাম, শান্তিগ্রাম ও বড়গ্রাম গঠনের পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন সময়ে সামরিক গ্যারিসন ও হেড কোয়ার্টার স্থাপন সবই জুম্মদের নিজ বাস্তুভিটা ও জমি থেকে উচ্ছেদের একেক ষড়যন্ত্র। বর্তমান ক্ষমতাসীন গণতান্ত্রিক বি, এন, পি সরকারও এহেন ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা গ্রহণে পিছিয়ে নেই। যেহেতু জুম্ম জনগণকে উচ্ছেদ করা পূর্বতন সরকারগুলির মত বর্তমান সরকারেরও অন্যতম লক্ষ্য ও একান্ত কাম্য। তাই বর্তমান বি, এন, পি সরকার এবার বনায়নের নামে গ্রহণ করেছে হাজার হাজার জুম্ম পরিবারকে উচ্ছেদ ও অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনভূমির উপর জুম্ম জনগণের সামাজিক মালিকানা ( Community Ownership ) সম্পূর্ণভাবে হরণ করার পরিকল্পনা।

বাংলাদেশ সরকার অতি সম্প্রতি তিন পার্বত্য জেলায় ১,৩০,০০০ একরের অধিক অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলে সংরক্ষিত বনায়ন গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ উদ্দেশ্যে সরকার রেজিষ্ট্রিকৃত বনভূমি অধিগ্রহণ করবে। কিন্তু এই অধিগ্রহণে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণে কি হাজার হাজার উচ্ছেদ জুম্ম পরিবারের মৌলিক চাহিদার সমাধান হবে ? মূলতঃ এই অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ কিছুই নয়। যেহেতু সরকার জানে যে খুব কম সংখ্যক পরিবারই তাদের হারানো বাস্তুভিটা ও বাগ-বাগিচার ক্ষতিপূরণ পাবে। কেননা এই অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল হচ্ছে জুম্ম জনগণের সামাজিক সম্পত্তি। যে কোন জুমিয়া পরিবার এরূপ বনাঞ্চলে জুম চাষ করার অধিকারী। তাই এই সামাজিক স্বত্ত্বাধিকারের আলোকে প্রয়োজন হয় না ব্যক্তিগত রেজিষ্ট্রিভুক্ত করার। কেবলমাত্র দখলীস্বত্বই এসব ভূমি ভোগ দখলের প্রধান স্বত্ত্ব। তাই খুব কম জুম্ম পরিবারই এই অধিগ্রহণে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের মুখ দেখবে।

অন্যদিকে এই বনায়ন পরিকল্পনার ফলে কয়েক হাজার জুম্ম পরিবার নিজ বাস্তুভিটা, বাগ-বাগিচা থেকে উচ্ছেদ হবে। বাগান কৃষি, জুম চাষ ও বনজসম্পদের উপর নির্ভরশীল জুম্ম পরিবারগুলিকে জীবন ধারণের জন্য হয়ত আরো গভীর অরণ্যে প্রবেশ করতে হবে, অথবা বন বিভাগের শ্রমিক অথবা দৈনিক মজুরে পরিণত হতে অথবা দেশান্তরী হতে বাধ্য হবে। জুম্ম জনগণকে এই উদ্দেশ্যমূলক সরকারী বনায়ন পরিকল্পনা অবশ্যই বানচাল করে দিতে হবে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে এগিয়ে আসতে হবে। যেহেতু সংগ্রামই দেশ ও জাতির অস্তিত্ব রক্ষা করার প্রধান উপায়।

# সরকারী বনায়ন পরিকল্পনা ও এর ভয়াবহ পরিণাম

বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি পার্বত্য চট্টগ্রামে বনায়নের এক বিতর্কিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ বনায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বান্দরবন জেলায় ৭,৩৮৯'২ একর, খাগড়াছড়ি জেলায় ৪টি উপজেলায় ৩৭,৩৮৭'৫০ একর এবং রাঙ্গামাটি জেলার ৬টি উপজেলায় ৩৫টি মৌজাস্থ ৮৬ হাজার একরের অধিক অশ্রেণীভুক্ত বনভূমি (Unclass State Forest) অধিগ্রহণ করা হবে। এ উদ্দেশ্যে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বন প্রশাসন-২ এর ৪/১/৯২ইং তারিখের শা-২/পবম-'৮৮/৯১ সূত্র মোতাবেক বিভিন্ন প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা ও মৌজাস্থ হেডম্যান ও চেয়ারম্যানকে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন একতরফা ভাবে জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে।

এটা ঠিক যে, ভূমণ্ডলের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে প্রাকৃতিক বনভূমির ভূমিকাই সর্বাধিক। মানব সভ্যতার বর্তমান পর্যায়ে একদিকে ব্যাপক বন ধ্বংস অন্যদিকে ব্যাপক আকারে কৃত্রিম শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে ভূমণ্ডলের প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ সংকটজনক বিন্দুতে পৌঁছে গেছে। ফলস্বরূপ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগ-বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, মহামারী ব্যাপক আকারে দেখা দিচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা আজ পরিবেশগত ভারসাম্যহীনতার জন্য সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। দেশে দেশে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে পরিবেশ সংরক্ষণের সেমিনার, সভা ও সম্মেলন। প্রতিবছর বিভিন্ন দেশে শুরু হয় বৃক্ষরোপণ অভিযান। আর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের সুপ্রতিষ্ঠিত অভিমত হলো যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দেশের ২৫ শতাংশ বনভূমি। দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা ছাড়াও দেশের বন্য পশুপক্ষী সংরক্ষণ, শিল্পজাত কাঁচামালের যোগান ও মানুষের নিত্যব্যবহার্য আসবাবপত্র ও প্রাকৃতিক সম্পদের প্রধান উৎস হচ্ছে বনভূমি। অর্থাৎ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বনভূমির গুরুত্ব অপরিমেয়। তাইতো আজ একটি নতুন শ্লোগান দিন দিন জোরালো হয়ে উঠছে—দাও ফিরে দাও সেই অরণ্য—লও এ নগর।

বক্ষ্যমান নিবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকার কর্তৃক গৃহীত এ বনায়ন পরিকল্পনাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কতটুকু বাস্তবসম্মত তা পর্যালোচনা করা, বন ও বনায়নের গুরুত্ব মূল্যায়ণ নয়। তাই এবারে আসা যাক সেই প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ সরকারের পার্বত্যাঞ্চলে এ বনায়ন পরিকল্পনাকে আপাতদৃষ্টিতে খুবই বাস্তবসম্মত মনে হবে। যেহেতু দেশের জন্য যেখানে ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন, সেখানে বাংলাদেশে বর্তমানে ১৪ শতাংশ মাত্র বনভূমি রয়েছে। এ বনভূমি আবার ব্যাপক বৃক্ষ নিধনের ফলে দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে অধিক বন সৃষ্টির ও পরিকল্পিত বনায়ন পরিকল্পনা গ্রহণের। আর পার্বত্য চট্টগ্রামই হচ্ছে এই বনায়নের উপযুক্ত ক্ষেত্র। পার্বত্যাঞ্চলের ছোটবড়, উচ্চনীচ হাজার হাজার পাহাড়ী ভূমিতে এই বনায়ন সম্ভব ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক। এ অঞ্চলে বনসৃষ্টির মাধ্যমে ধ্বংসপ্রায় বন্য প্রাণীকুলকে যেমন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে, তেমনি কাগজ, রেয়ন, প্লাইউড, দিয়াশলাই প্রভৃতি বনজ নিঃসৃত শিল্পের কাঁচামাল, জ্বালানী কাঠ, নিত্যব্যবহার্য বাড়ীর আসবাবপত্রের কাঠের যোগান মিটানো সম্ভব হবে। এ বনজ সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান করে দেশের বেকার সমস্যা নিরসন ও সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হবে। সর্বোপরি পরিবেশগত ভারসাম্যও সংরক্ষিত হবে। এখানে আরো একটি বিষয় স্বাভাবিকভাবে এসে যায়, তা হলো দেশের অন্যান্য সমতল জেলার বনায়ন কর্মসূচীর পাশাপাশি পার্বত্যাঞ্চলের এই বনায়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

উপরোক্ত যৌক্তিকতার আলোকে পার্বত্যাঞ্চলে এ বনায়ন পরিকল্পনাকে খুবই বাস্তবসম্মত মনে হয়। তাই এ কর্মসূচীর বিপক্ষে স্থানীয় জনগণের কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া না হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা গেল যে, এই বনায়ন পরিকল্পনা গ্রহণে স্থানীয় জুম্ম জনগণ সন্তুষ্ট হতে পারেনি, তারা এই বনায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। এ বনায়ন পরিকল্পনায় কাশখালী মৌজাকে বন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ও বেতবুনিয়া সেগুন বাগান সৃষ্টির সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বেতবুনিয়া ও কাশখালী মৌজার কয়েকশত অধিবাসী ১০১ সদস্য বিশিষ্ট "সংরক্ষিত বনভূমি গঠন প্রতিরোধ কমিটি" গঠন করে গত ১৫ই জুলাই রাঙ্গামাটিতে বিক্ষোভ মিছিল এবং রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, জেলা প্রশাসক ও আঞ্চলিক কম্যানডারের কাছে স্মারকলিপি পেশ করেছে (ভোরের কাগজ, ২৭ জুলাই/৯২)। গত ১৯শে জুলাই ঘাগড়া মৌজার হেডম্যান স্নেহকুমার দেওয়ানের সভাপতিত্বে তার বাসভবনে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের জারীকৃত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ১৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে প্রতিবাদ কার্যক্রম চালানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

(গিরি দর্শন, ২৭ জুলাই/৯২)। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকারের খয়েরখাঁ ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ সদস্য মিঃ স্নেহ কুমার দেওয়ান সরকারী এই বনায়ন পরিকল্পনার তীব্র প্রতিবাদ ও বানচাল করার আহবান জানিয়েছেন। এছাড়া চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিরূপ প্রভাবের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বাংলাদেশ সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রীর নিকট এ বনায়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার আবেদন করেছেন। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদও এই বনায়ন পরিকল্পনাকে বনায়নের নামে পাহাড়ী উচ্ছেদ অভিযান আখ্যা দিয়ে প্রতিবাদ ও বিবৃতি প্রদান করেছে। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ বিবৃতিতে অভিযোগ করে যে, এর ফলে পার্বত্যাঞ্চলের ৫০ হাজার পরিবার তাদের জায়গা জমি হারাবে। তাই বনাঞ্চল গঠনের এই সরকারী সিদ্ধান্ত জনগণকে উচ্ছেদ করার নগ্ন ষড়যন্ত্রের এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। এসব প্রক্রিয়ায় এটা স্পষ্ট যে, বনায়নের এই সরকারী সিদ্ধান্ত জুম্ম জনগণের আরো এক অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং জুম্ম জনগণ সরকারী এই বনায়ন পরিকল্পনাকে বানচাল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

জুম্ম ছাত্র-জনতার এ প্রতিবাদের প্রেক্ষিতে তাই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন এসে যায় যে, জুম্ম জনগণ কেন এই-বনায়ন পরিকল্পনার বিরোধিতা করছে? এটা কি জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থীমূলক পরিকল্পনা? এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর এই বনায়ন পরিকল্পনার কি প্রভাব পড়বে এবং এতে জুম্ম জনগণ কতটুকু লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা মূল্যায়ণ করতে হবে। এবারে এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

এ বনায়ন পরিকল্পনা জুম্ম জনগণকে তাদের ভূমিস্বত্ব থেকে বঞ্চিত করার এক ষড়যন্ত্র। যেহেতু এ জেলার তফশিলি ও অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল জুম্ম জনগণের সামাজিক সম্পত্তি (Community Property)। জুম্ম জনগণ এ বনাঞ্চলে একচেটিয়া জুম চাষ করার অধিকারী। এক্ষেত্রে তাদেরকে কোন জুম ক্ষেত্রের জন্য বন্দোবস্তি করতে হয় না। কেবলমাত্র ফলকৃত জুমের উপরই খাজনা প্রদান করতে হয়। তাই এ সংরক্ষিত বনায়ন পরিকল্পনা হচ্ছে তফশিলি ও অশ্রেণীভুক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলের উপর জুম্ম জনগণের সামাজিক মালিকানাস্বত্ব রহিত করা।

জুম্ম জনগণের বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অনুচ্চ পাহাড়ের ঢালে জুম চাষই জুম্মদের প্রধান উপজীবিকা। বর্তমানেও ৬০% পরিবার ভূমিহীন ও এই জুম চাষের উপর নির্ভরশীল। তাই তফশীল ও অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চলে সংরক্ষিত বন সৃষ্টি করা হলে জুম চাষের উপর **নির্ভরশীল জুম্ম পরিবারদেরকে জুম চাষের আর কোন ক্ষেত্রই থাকবে না। ফলে হাজার হাজার জুম্ম পরিবার জীবিকাহীন হয়ে পড়বে।**

রাঙ্গামাটি জেলার বনায়ন কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত উপজেলা-সমূহের অধিকাংশ জুম্ম পরিবার কাপ্তাই বাধের উদ্বাস্তু ও স্ব-পুনর্বাসিত। এসব উপজেলার অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চলে জুমচাষ, ফলের বাগান চাষ, বনজ বাঁশ, গাছ, শণ প্রভৃতি আহরণই এসব জুম্ম পরিবারদের প্রধান উপজীবিকা। এই বনায়ন পরিকল্পনার ফলে এসব বাগানচাষী হাজার হাজার জুম্ম পরিবার তাদের বাস্তুভিটা ও বাগান থেকে উচ্ছেদ ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল জুম্ম পরিবারগুলি সম্পূর্ণভাবে উপায়হীন হয়ে পড়বে।

এই বনায়ন পরিকল্পনাতে কাশখালী মৌজাকে বন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ও বেতবুনিয়া মৌজাতে সেগুন বাগান সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে দুই মৌজাস্থ অধিবাসীরা সম্পূর্ণভাবে নিজ বাস্তু ভিটা ও বাগ-বাগিচা থেকে উচ্ছেদ হবে।

এ বনায়নের সরকারী মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এক সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু এমন এলাকায় বনায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে, যেখানে জুম্ম জনগণই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সৃষ্ট বনজ সম্পদ থেকে কেবলমাত্র সরকারই লাভবান হবে। কেবলমাত্র রাঙ্গামাটি জেলায় বনায়নের এলাকাগুলো পর্যালোচনা করলে এটা পরিষ্কার হয়ে উঠে। যেমন—রাঙ্গামাটি সদরের হেমন্ত, বসন্ত, কাশ্যা ও ফুলগাজী বাগেরছড়া, কুতুকছড়ি, শূকরছড়ি, সাপছড়ি ও মাণিকছড়ি মৌজা, নানিয়াচর থানার কাঙেলছড়ি, তৈচাকমা, চৌধুরীছড়া, ঘিলাছড়ি ও হাজাছড়া মৌজা, কাউখ্যালী থানার চট্টগ্রাম জেলা পরিবেষ্টিত কাশখালী ও বেতবুনিয়া ও ঘাগড়া মৌজা, লংগদু থানার আটরকছড়া, লংগদু উবদাছড়ি মৌজা, কাপ্তাই থানার ওয়াপ্পা, রাইখালী, পেকুয়া, আরাছড়ি, কতুবদিয়া, বল্লালছড়ি, বারংগোলা এবং রাজস্থলী থানার কাকরাছড়ি, চিং কিয়ং, পোওয়াই খো, কাপ্তাই, গাইন্দা, ঝিমরাম, ঘিলাছড়ি, কুকা, ধনুছড়ি মৌজায় বন সৃষ্টি করা হবে। এসব এলাকার অধিবাসীরা সবাই জুম্ম এবং এদের অধিকাংশ জুম চাষ ও বাগান চাষের উপর নির্ভরশীল। এসব জুম্মদের নিজ বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ ও নিঃস্ব করার সরকারী লক্ষ্য সুস্পষ্ট। আর চট্টগ্রাম-রাঙ্গামাটি সড়ক ও কাপ্তাই হ্রদের পার্শ্বস্থ এসব এলাকার বনজ সম্পদ অতি সহজে আহরণ করে পার্বত্যাঞ্চলের বনজ সম্পদ লুট করাও সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। তাই এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, জুম্ম জনগণের আর্থ-

সামাজিক অবস্থা বিবেচনা না করে শুধুমাত্র সরকারী স্বার্থের দিক বিবেচনা করে এই বনায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমনটি করা হয়েছিল শিল্পায়নের নামে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

বনায়নের জন্য নির্ধারিত এলাকার জুম্ম জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর এই বনায়ন পরিকল্পনার ভবিষ্যত পরিণাম অত্যন্তভয়াবহ। এই বনায়নের ফলে হাজার হাজার জুম্ম পরিবার নিজ বাস্তুভিটা ও বাগ-বাগিচা থেকে উচ্ছেদ হবে। ভূমিহীন জুমিয়া পরিবারগুলি জুম চাষের ক্ষেত্র হারাবে, অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল থেকে বাঁশ, গাছ, জ্বালানী কাঠ, শণ সংগ্রহ ও বিক্রির উপর নির্ভরশীল পরিবারগুলির জীবিকার্জনের কোন উপায় থাকবে না, এসব এলাকার আনাচে-কানাচে ছোট ছোট ধান্য জমিগুলি জুম্মদের হাতছাড়া বা অকেজো হয়ে পড়বে। এ অবস্থায় এসব উদ্বাস্তু ও নিঃস্ব পরিবারগুলি বন মজুর, দিন মজুরে পরিণত হবে নতুবা জুম চাষের জন্য আরো দুর্গম অঞ্চলে যেতে হবে। জুম্ম জনগণের এই অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ পরিণাম কিন্তু ঢাকার বনায়ন পরিকল্পনাকারীদের বিবেচ্য নয়। তাদের বিবেচ্য বনায়নের মাধ্যমে সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি ও দেশের ধনী শ্রেণীর বিলাসী আসবাব-পত্রের জন্য সেগুন কাঠের বনাঞ্চল সৃষ্টি। ইতিমধ্যে অবশ্য বাংলাদেশ সরকারের বন বিভাগ পার্বত্যাঞ্চলে কয়েক হাজার একর সেগুন বাগান সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে দেশের বড় বড় শহর, নগর ও বন্দরে ধনী বিলাসীদের গৃহে এ সেগুন কাঠ শোভা বর্ধন করে চলেছে। এই শোভাবর্ধন প্রক্রিয়া চালু রাখতে তাই এবারে গ্রহণ করা হয়েছে লক্ষাধিক একরে সেগুন বাগান সৃষ্টির পরিকল্পনা। তাই বনায়ন পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্যাঞ্চলের বনজ সম্পদের লুণ্ঠন।

সরকারী এই বনায়ন পরিকল্পনার এই পর্যালোচনা থেকে এটা অবধারিতভাবে বলা যায় যে, বনায়নের এই সরকারী পরিকল্পনা সম্পূর্ণ জুম্ম স্বার্থ পরিপন্থী। নির্ধারিত এলাকা থেকে জুম্মদের উচ্ছেদ, সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি ও পার্বত্যাঞ্চলে বনজ সম্পদ লুণ্ঠনের লক্ষ্যে এই বনায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের শিল্পায়ন, উন্নয়ন, পুনর্বাসন ও বনায়নের নামে জুম্ম জনগণকে উচ্ছেদ ও নিঃস্ব করার এক ষড়যন্ত্র এই বনায়ন পরিকল্পনা। বলা বাহুল্য এই বনায়ন পরিকল্পনা পূর্ব অনুসৃত জুম্ম উচ্ছেদ নীতিরই এক নগ্ন বহিঃপ্রকাশ। তাই জুম্ম ছাত্র-জনতা এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে ও এই পরিকল্পনা বানচাল করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। জুম্ম জনগণ প্রত্যাশা করে যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার জুম্ম জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর এই বনায়ন পরিকল্পনার ভয়াবহ পরিণাম অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন।

## পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে ইউরোপিয়ন পার্লামেন্ট

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টে মিসেস পোল্লাক (Pollack), মিঃ টেল কাম্পার (Co-Chairman, CHT Commission), মিঃ ডি, লা, ম্যালেনে (Malene), মিঃ ভান্দেমোলব্রুক (Vandemaulbruck), মিঃ হার্জট এবং নিবাদা সিলভা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে এক যৌথ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মিসেস পোল্লাক ও মিঃ টেল কাম্পার কর্তৃক ইতিপূর্বে আনীত যৌথ প্রস্তাবমূলে গৃহীত সিদ্ধান্তবলীর সঙ্গে সংগতি রেখে—

১। ১০ই এপ্রিল, ১৯৯২ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রামের লোগাং-এ শত শত নিরস্ত্র বেসামরিক জুম্ম জনগণের উপর সংঘটিত গণহত্যায় আতংকিত হয়ে,

২। কাউখালী (১৯৮০) ও লংগদু (১৯৮৯) গণহত্যার তদন্ত রিপোর্ট পূর্বেকার তদন্ত কমিটি যেহেতু প্রকাশ করেনি,

৩। যেহেতু জুম্ম জনগণকে জোরপূর্বক গুচ্ছগ্রামে স্থানান্তরিত করে বাঙালীদেরকে তাদের জায়গা জমি বেদখল করার সুযোগ করে দেয়া হচ্ছে সেহেতু ইউরোপিয়ান পার্লামেন্ট—

১। লোগাং গণহত্যার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছে;

২। বিচারপতি সুলতান হোসেন খানের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের নিকট আহ্বান জানাচ্ছে;

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামে সামরিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে;

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে এবং সেখানকার আদিবাসীদেরকে জোরপূর্বক স্থানান্তরকরণ নীতি পরিত্যাগ করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে;

৫। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতি নজরে রাখার উদ্দেশ্যে একজন বিশেষ তদন্তকারী প্রতিনিধি নিয়োগ করার জন্য জাতি সংঘের মানবাধিকার কমিশনের নিকট আহবান জানাচ্ছে ;

৬। সম্ভব ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি কমিশন প্রেরণসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়টির অনুসন্ধান করতে ইহার মানবাধিকার বিষয়ক সাব-কমিটিকে নির্দেশ দিচ্ছে ;

৭। পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের নজরে আনার জন্য ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের প্রেসিডেন্ট, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টারী কমিটি এবং মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনের নিকট আহবান জানাচ্ছে ;

৮। এই সিদ্ধান্তবলী মানবাধিকার কমিশন, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টারী কমিটি, জাতি সংঘের মহাসচিব ও বাংলাদেশ সরকারের কাছে প্রেরণের ব্যবস্থা করতে ইহার প্রেসিডেন্টকে নির্দেশ দিচ্ছে।

# European Parliament adopts resolution on CHT

The European Parliament.

— Having regard to its previous resolutions on Bangladesh,

A. Alarmed at the reported massacre on 10 April 1992 of hundreds of unarmed Jumma civilians in Logang, Chittagong Hill Tracts (CHT). Bangladesh,

B. Whereas earlier inquiry committees into massacres in Kaukhali (1980) and Longadu (1989) did not make their reports public,

C. Whereas the Jumma people are subject to forcible relocation in large numbers into 'cluster villages' to make way for Bengali occupants of Jumma lands.

1. Vigorously condemns the massacres in Logang ;

2. Calls on the Government of Bangladesh to publish the full outcome of the inquiry to be undertaken by Justice Sultan Hussein Khan ;

3. Calls on the Government of Bangladesh to terminate military involvement in the CHT area ;

4. Calls on the Government of Bangladesh to respect human rights in the CHT and to end its policy of forcible relocation of indigenous people ;

5. Calls on the United Nations Commission on Human Rights which has heard this case to appoint a special rapporteur to monitor the situation in the Chittagong Hill Tracts ;

6. Instructs its Sub Co-mmittee on Human Rights to investigate the matter including if possible a mission to the Chittagong Hill Tracts ;

7. Calls on its President, EPC and the Commission to bring the matter to the attention of the Government of Bangladesh ;

8. Instructs its President to forward this resolution to the Commission, EPC, the UN Secretary-Genaral and the Government of Bangladesh.

PV 28 11
17.09.1992

PE 161.873

## রিওডি জেনিরো সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ

গত ২৫— ৩০শে মে ব্রাজিলের রাজধানী রিওডি জেনিরোর কারিওকাতে বিশ্বের আদিবাসীদের অঞ্চল, পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ের উপর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমেরিকা, আফ্রিকা, ইউরোপ, ওসিনিশিয়া ও এশিয়ার আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। এই সম্মেলনে জুম্ম প্রতিনিধিগণ পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিবেশ দূষিতকরণ ও বিতর্কিত উন্নয়নসহ জুম্ম জনগণের উপর সকল প্রকার মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি আলোচনা করেন। এই আলোচনার প্রেক্ষিতে সম্মেলনে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তবলী সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকৃতি দেয়া।

২। পিতৃভূমির উপর জুম্ম জনগণের জন্মগত অধিকার পুনঃনিশ্চিত করা।

৩। বাংলাদেশের প্রতিটি সরকার কর্তৃক জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা।

৪। আন্তর্জাতিক অনুসন্ধানী কমিশনের ১৯৯১ সালের মে মাসের রিপোর্ট অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম সামরিক শাসনাধীনে রয়েছে।

৫। বিপুল সংখ্যক অজুম্ম বসতিকারীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানান্তরের সরকারী নীতির ফলে পরিস্থিতির অধিকতর অবনতি ঘটেছে।

৬। গভীরভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করা গেল, আশু পদক্ষেপ নেওয়া না হলে জুম্ম জনগণ পূর্ণ বিলুপ্তির সম্মুখীন হবেন।

৭। পরিশেষে এই সম্মেলনে ১০ই এপ্রিলে লোগাং গুচ্ছগ্রামে ১,২০০ আদিবাসীকে হত্যা করার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে নিন্দা জ্ঞাপন করছে ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে নিন্দা জ্ঞাপনের আহবান জানাচ্ছে।

## রাঙার নিষিদ্ধ

গত ১৭ই আগষ্ট বাংলাদেশ সরকার 'রাঙার' প্রকাশনার উপর দ্বিতীয়বারের মত নিষেধাজ্ঞা জারী করেছে। 'রাঙার' প্রকাশনার উপর এই সরকারী নিষেধাজ্ঞায় জুম্ম ছাত্রসমাজ, বুদ্ধিজীবী, চাকুরীজীবী ও সাধারণ পাঠকসমাজ দারুণ বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। যেহেতু প্রকাশনার পাঁচ সংখ্যার মধ্যে 'রাঙার' জুম্ম জনগণের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কেননা রাঙার জুম্ম জনগণের উপর সকল প্রকার মানবাধিকার লংঘনের সংবাদ ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে বক্তব্য প্রকাশ করে আসছে। এতে পার্বত্য চট্টগ্রামে কর্মরত বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দুর্নীতি ও অত্যাচারীর মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। বিজ্ঞ মহলের ধারণা এই সেনা সদস্যদের এই মুখোশ উন্মোচনই 'রাঙার' প্রকাশনার নিষিদ্ধকরণের প্রধান কারণ।

## জেনেভা সম্মেলনে জুম্ম সমস্যা

বিগত জুলাই ও আগষ্ট মাসে জাতি সংঘের আদিবাসী সংস্থা (UN Working Group on Indigenous Population) এবং বৈষম্য প্রতিরোধ ও সংখ্যালঘু প্রতিরক্ষার সাব-কমিটি UN Sub-Committee on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities) এর পর পর দুটি সম্মেলন জেনেভাতে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সহ-সভাপতি প্রফেসর ডগ্লাস সেণ্ডারস জুম্ম জনগণের উপর মানবাধিকার লংঘনের বিষয়টি উত্থাপন করেন। প্রথমোক্ত সম্মেলনে তিনি অভিযোগ করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রনাধীন এবং খালেদা জিয়ার বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এরশাদের গৃহীত নীতি কার্যকরী রেখে জুম্ম জনগণের মৌলিক অধিকার লংঘন করে চলেছে। ১০ই এপ্রিল সংঘটিত লোগাং হত্যাকাণ্ডকে তিনি মানবাধিকার লংঘনের উদাহরণ হিসেব উল্লেখ করেন। এ সম্মেলনে ডঃ আর, এস, দেওয়ানও বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে লোগাং হত্যাকাণ্ডসহ সকল প্রকার মানবাধিকার লংঘনের অভিযোগ উত্থাপন করেন।

আগস্টের সম্মেলনে ডগ্লাস সেণ্ডারস পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের সদিচ্ছার উপর সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি এ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার করে বেসামরিক শাসন প্রবর্তন, ভূমি সমস্যার সমাধান, স্বায়ত্বশাসন প্রদান এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতির বিষয়ে আন্তর্জাতিক সজাগ দৃষ্টি রাখার সুপারিশ করেন।

## সার্ভাভাইল ইন্টারন্যাশনালের মাসিক ধর্ণা

লণ্ডনভিত্তিক সার্ভাভাইল ইন্টারন্যাশন্যাল জুম্ম গণহত্যার বিরুদ্ধে এক অভিনব বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনায় সংস্থাটি প্রতি মাসের শেষ বৃহস্পতিবারে লণ্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে দুপুর ১২টা হতে ২টা পর্যন্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন করবে। গত ২৭শে আগস্ট হতে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করেছে এবং জুম্ম গণহত্যা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখবে। এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় জুম্ম জনগণের উপর বাংলাদেশ সরকারের অত্যাচার, নির্যাতন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা সকল প্রকার মানবাধিকার লংঘনের তথ্য পরিবেশন ও প্রতিবাদ করা হয়। সংস্থাটি এই মাসিক বিক্ষোভে অংশগ্রহণের জন্য সকল মানবতাবাদী ব্যক্তিত্বকে আহবান জানিয়েছে। উল্লেখ্য যে, এরূপ প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে গত বছর ১০০ সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে সংস্থাটি ব্রাজিলের ইয়ানোমামি (Yanomami) ভূমি চিহ্নিতকরণে সফল হয়েছে। এই সংস্থা মনে করে যে, এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের জুম্ম গণহত্যার নীতির পরিবর্তন করতে সক্ষম হবে।

## ত্রিপুরার চাকমা জাতীয় সম্মেলন

আগরতলা, ১৩ই অক্টোবর। গত ১১ই ও ১২ই অক্টোবর স্থানীয় বোধজং বয়েজ স্কুলে ত্রিপুরার অধিবাসী চাকমাদের ২ দিনের এক জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চাকমা জাতির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার নিশ্চিত করাই ছিল এই সম্মেলনের লক্ষ্য। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলের চাকমা প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

এই সম্মেলনে চাকমা ভাষাকে পৃথক ভাষার মর্যাদাদান, চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চলে চাকমা হরফে চাকমা ভাষায় শিক্ষাদান, চাকমা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন, আগরতলা আকাশবাণীতে ৩০ মিনিটের চাকমা ভাষার অনুষ্ঠান, চাকমা ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ প্রদান, বৌদ্ধ মন্দির সংস্কারের অনুদান, বৌদ্ধ ছাত্রাবাস ও অতিথিশালা স্থাপনসহ ত্রিপুরার স্ব-শাসিত জেলা পরিষদে চাকমাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা ও চাকমা আর্থ-সামাজিক ও আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক পরিষদ গঠনের দাবী করা হয়।

এছাড়া এই সম্মেলনে ত্রিপুরাতে অবস্থানরত জুম্ম শরণার্থীদেরকে জীবনের পূর্ণ নিরাপত্তা ও হৃত সম্পত্তির পুনঃপ্রত্যার্পনের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে জোরপূর্বক বাংলাদেশে ফেরত না পাঠানোর দাবী করা হয়। সম্মেলনের শেষে চাকমা নেতৃবৃন্দ এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন।

## Communal Riot at Dighinala

An innocent Jumma was killed and more than fifty were injured in a communal riot committed by the muslim infiltrators in league with army and local BNP workers on 13 October. The rioters attacked a procession of Jumma people arranged by the CHT Hill Student's Council to inaugurate its Thana branch with prior permission from the local authority. In order to foil the inaugural meeting the BNP workers arranged a procession demanding stop of all activities of the

CHT Hill Student's Council on October 12. They also organised and instigated the muslim infiltrators for the riot and declared stop of all moevs of transport and shops on the following day.

On the day, with a view to crossing the Maini river 2-3 thousand students, men and women gathered at the ferry-ghat. But all the ferry-boats were already sunk by the BNP workers to prevent the crowd from joining the meeting. So, they had to advance towards the Maini bridge to cross the river. But when the procession was on the bridge the army blew up whistle and the pre-organised muslim infiltrators fell upon them with spears, sticks, iron-rods etc. As a result, Mr. Bharadwaj Chakma (60 yrs). was killed on the spot and others injured.

In another incident, on the way to Dighinala from Khagrachari two trucks carrying about 60-70 Jumma students were stopped and attacked by a group of muslim infiltrators led by a BNP worker at Jamtali, 3 km from Dighinala. Some students were injured in the clash and thereafter. the army forced the students back to Khagrachari.

According to some eye witnesses, it was a pre-planned riot committed by hundreds of muslim infiltrators instigated by the BNP workers and army. Lt. Col. Sharif (Dighinaia Brig.), Major Haidar (7 field artillery Brig.), Jafar Ahmed (President, BNP Dighinala), Nurul Islam (BNP), Oyadul Jamal (Compoundar Merung), Sona Mia, Masud Rana (Owner of studio Shapla) were among the leading rioters. To avoid the responsibility of the riot the Police arrested 5 infiltrators on 16 October but released them on the same day. On the other hand, 3 Jumma students namely Ripan Chakma, Amiya Chakma, Ramendra Chakma were arrested and detained in the Dighinala Police Station on 17 October. The arrest of the students was surely aimed at the interruption of the activities of the CHT Hill Student's Council.

## দিঘীনালায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

গত ১৩ই অক্টোবর দিঘীনালায় পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের থানা শাখা উদ্বোধন উপলক্ষে আহূত এক সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে অগ্রসরমান পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রী ও জনগণের উপর হামলা চালিয়ে অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙালীরা ১ জনকে নিহত ও অর্ধ শতাধিক জুম্মকে আহত করেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের থানা শাখা উদ্বোধন বানচাল করার জন্য স্থানীয় বি, এন, পি, কর্মীরা অনুপ্রবেশকারীদের সংগঠিত করে ১২ই অক্টোবর দিঘীনালাতে এক মিছিল বের করে ছাত্র পরিষদের সকল কার্যক্রম বন্ধ করার ও সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়। মিছিলকারীরা পরদিন সকল প্রকার যানবাহন ও দোকানপাট বন্ধ করার ঘোষণা দেয়। পরদিন সমাবেশে যোগদান করার জন্য ২-৩ হাজার জুম্ম ছাত্র-ছাত্রী ও জুম্ম জনতা দিঘীনালা স্কুল অভিমুখে রওনা হয়। ইতিমধ্যে মাইনি নদীর খেয়া পারাপার বন্ধ করে দিলে জুম্ম জনতা মাইনি ব্রিজ দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু জুম্ম জনতা ব্রিজের উপর পৌঁছার সাথে সাথে তথায় অবস্থানরত আর্মিরা বাশী বাজালে শতশত অনুপ্রবেশকারী ধারালো অস্ত্র, বল্লম, ইট-পাটকেল নিয়ে জুম্ম জনতার উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে নিরস্ত্র জুম্মরা কোন প্রকার প্রতিরোধ করতে পারেনি। অনেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হলেও অর্ধ শতাধিক জুম্ম শিশু, ও বৃদ্ধ নর-নারী আহত ও ৬০ বৎসরের ভরদ্বাস মনি চাকমা ঘটনাস্থলে নিহত হয়। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলাকালে আর্মিরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে ও পরিশেষে ১ ঘন্টার পর ৪ বার ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে অনুপ্রবেশকারীদেরকে কেটে পড়ার নির্দেশ দেয়।

এদিকে উক্ত সমাবেশে যোগদানের উদ্দেশ্যে ৬০/৭০ জন জুম্ম ছাত্র-ছাত্রী দুটো ট্রাক নিয়ে খাগড়াছড়ি থেকে দিঘীনালার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু দিঘীনালার নিকটবর্তী জামতলায় অনুপ্রবেশকারীরা পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের গতিরোধ করে ও আক্রমণ চালায়। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে ও উভয়

পক্ষের কয়েকজন হতাহত হয় বলে জানা যায়। পরিশেষে আর্মিরা এসব ছাত্র-ছাত্রীদেরকে খাগড়াছড়ি ফিরে যেতে বাধ্য করে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করা হয়। কয়েক শত অনুপ্রবেশকারী বি, এন, পি, কর্মীদের উস্কানি ও আর্মিদের ছত্রছায়ায় এই দাঙ্গা সংঘটিত করে। লেঃ কর্ণেল শরীফ (দিঘীনালা ব্রিগেড), মেজর হায়দার(—৭ ফিল্ড আর্টিলারি ব্রিগেড,) মাসুদ রাণা (স্টুডিও শাফলার মালিক), জাফর আহম্মদ—সভাপতি, বি, এন, পি, দিঘীনালা শাখা, নুরুল ইসলাম—বি, এন, পি, নজরুল ইসলাম সওদাগর, ওয়াছুল জামাল (কম্পাউণ্ডার, বেরুং), সোনা মিঞা প্রমুখ দাঙ্গাকারীদেরকে প্রত্যক্ষভাবে নেতৃত্ব দেয়। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দায়-দায়িত্ব এড়ানোর জন্য ঘটনার নায়কেরা ১৬ই অক্টোবর ৫ জন বাঙালীকে গ্রেপ্তার করে সেদিনই ছেড়ে দেয়। অপরদিকে ১৭ই অক্টোবর পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের থানা শাখার রিপন চাকমা, অমিয় চাকমা ও রমেন্দ্র বিকাশ চাকমাকে উক্ত ঘটনার জন্য দায়ী করে থানায় আটক করা হয়। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের কার্যক্রম বন্ধ রাখাই এ গ্রেপ্তারের প্রধান উদ্দেশ্য। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়নি।

## প্রো'র (PRO) সম্মেলনে চাকমা ও হাজং সমস্যা

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর নূতন দিল্লীতে ভারতের প্রখ্যাত মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব, আইনবিদ, অধ্যাপক ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন পিপলস্ রাইটস্ অর্গানাইজেশন (প্রো) এর এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ভারতে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও বিভিন্ন অত্যাচারিত গোষ্ঠীর উপর মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আগরতলাভিত্তিক হিউম্যানিটি প্রোটেকশন ফোরামের সভাপতি শ্রী ভাগ্য চন্দ্র চাকমা এই সম্মেলনে অরুণাচলে বসবাসরত চাকমা ও হাজং সম্প্রদায়ের নাগরিক অধিকার বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন—১লা জানুয়ারী, ১৯৬৬ এর পূর্বে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত চাকমাদেরকে আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও মিজোরামে নাগরিকত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু, অরুণাচলে পুনর্বাসিত চাকমা ও হাজংদেরকে নাগরিকত্ব দেয়া হয়নি, যা ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নং ধারার লংঘন স্বরূপ। এই সম্মেলনে নাগরিকত্বহীন চাকমাদের উপর বিভিন্ন অত্যাচারের উপরও আলোকপাত করা হয়।

পরিশেষে এই সম্মেলনে অরুণাচলের চাকমা ও হাজংদের নাগরিকত্ব প্রদানের জোর দাবী জানানো হয়। উল্লেখ্য যে, এই দাবী দিন দিন জোরদার হয়ে উঠছে। অতি সম্প্রতি ভারতের লোকসভার বিরোধী নেতা ও বি জে পি প্রধান শ্রী এল, কে, আদবানী, সোমনাথ চ্যাটার্জী (এম, পি), মিঃ ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত (এম, পি), শ্রী মনোরঞ্জন ভক্ত (এম, পি) প্রমুখ চাকমাদের নাগরিকত্ব প্রদানের দাবী জানিয়েছেন।

## জন সংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের বৈঠক

খাগড়াছড়ি, ৬ই নভেম্বর। গতকাল স্থানীয় সার্কিট হাউজে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে রুদ্ধদ্বার ৭ম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দু'পক্ষের মধ্যেকার অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ বৈঠকের সুদীর্ঘ তিন বছর ১১ মাসের পরে এ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিগত ১৯ বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের অস্তিত্ব রক্ষার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতির সশস্ত্র আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে এটাই হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারের সাথে জন সংহতি সমিতির প্রথম ও সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক। এদিন পানছড়ি এলাকার দুদুকছড়া হতে জন সংহতি সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দকে হেলিকপ্টারযোগে সকাল ১০টা ২২মিঃ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে নেয়া হয়। সেখানে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আন্তরিক পরিবেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে উভয় পক্ষই সুদীর্ঘ ৬ ঘণ্টা আলোচনা করেন। বৈঠকে উভয় পক্ষই আলোচনা ও সমঝোতার সুষ্ঠু পরিবেশ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতি ও যোগাযোগের মাধ্যমে পরবর্তী বৈঠকে বসতে সম্মত হন। জন-সংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ বর্তমান নির্বাচিত সরকারের দ্বারা পার্বত্য

চট্টগ্রাম সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এ বৈঠকে জন সংহতি সমিতির পক্ষে নেতৃত্ব দেন সমিতির সভাপতি শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা (সন্তু) এবং বাংলাদেশ সরকারী দলের প্রধান ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটির আহবায়ক জনাব কর্ণেল (অবঃ) অলি আহম্মদ। জন সংহতি সমিতির অন্যান্য প্রতিনিধিরা হলেন—শ্রী গৌতম চাকমা, শ্রী রূপায়ন দেওয়ান, শ্রী সুধাসিন্ধু খীসা এবং শ্রী রত্নোৎপল ত্রিপুরা এবং সরকারী দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন—জনাব শাহজাহান চৌধুরী, জনাব সৈয়দ ওহিদুল আলম, জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান, জনাব বরকত উল্লা, জনাব মোশতাক আহম্মদ ও শ্রী কল্প রঞ্জন চাকমা। সরকারী কমিটির অন্য দুজন সদস্য ওয়ার্কার্স পার্টির রাশেদ খান মেনন ও জামাতে ইসলামীর জনাব শাহজাহান চৌধুরী বৈঠকে অনুপস্থিত ছিলেন।

---

সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারণাঃ তথ্য ও প্রচার বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি।